



# জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে

( প্রথম সংখ্যা )



BCU  
2411

অধ্যাপক শান্তিময় রায়

## প্রতিরোধের শপথ

আমরা জাতি হিসাবে আত্মত্যাগীত সংকটজনক পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছি তার গুরুত্ব এবং পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে আজ সকলেই অবহিত আছি। জাতীয় সংহতি, গণতান্ত্রিক ও মানবিকমূল্য-বোধের প্রতিকূল এক অশুভ শক্তি যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা আজ আর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় বস্তু মাত্র নয়। একটি মহান ও সুসভ্য জাতি হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে এ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথার্থ কোন দেশপ্রেমিক বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য-কলাপ শুধু মাত্র দর্শকের দৃষ্টিকোন থেকে দেখে থাকতে পারেন না, পারেন না তদুৎপন্নিত মর্মপীড়া দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করে যেতে।

জাতীয় রাজনীতিতে বোঝাপড়ার যে একটা শুভ সূচনা ক্রম বিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই যে বোঝাপড়া তা সকল দেশপ্রেমী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি আনবে, এর দরুন আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার, এমন কি আমাদের স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতি থেকে বিচ্যুত করার আন্তর্জাতিক কায়দেমী স্বার্থান্বেষীদের ঘৃণা প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করা যাবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে (খুব সম্ভবতঃ) আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ঐতিহ্যকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন। সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছেন না। স্বাধীন বিদেশ নীতির জন্য আমাদের যে সংগ্রাম তা জাতীয় সংহতি অর্জনের সংগ্রামেরই সমতুল্য, এবং নেতাজী, গান্ধীজি, নেহেরু, প্রমুখের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুশত শহীদদের—যেমন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফা-কুল্লাহ, সূর্যাসেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, কণকলতা, লক্ষণপ্রধান প্রভৃতি ব্যক্তিদের আশা আকাংক্ষার সমবিন্দু অভিমুখী।

বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আমাদেরই কিছু কিছু দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরের জনস্বার্থ বিরোধী শক্তি ক্রমবিলীণমান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থ স্বাধিত্ব রক্ষার জন্য উন্নত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, গড়ে তুলছে অত্যন্ত বিপদজনক আর্তাত। এই যে আর্তাত তা রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক বস্তুগত প্রয়োজন যা কেবল রাজনীতির মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। এহেন আর্তাত জোট যে সব সুযোগ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাচ্ছে তা এভাবে বলা যায়—

- (১) বিভিন্ন অঞ্চলে অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন-যার ফলে সঙ্গতি বিহীন কর্মসংস্থান করা হয়েছে।
- (২) কথা ভাষার ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, শিক্ষা ও সাফল্যতা অর্জনের বৈষম্য।
- (৩) ধর্ম ও জাতপাত।
- (৪) রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক শিক্ষা।
- (৫) অনগ্রসর অর্থনীতি এবং অনুন্নত সংস্কৃতি—

এই বিষয়গুলিকে জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হয়। এই বিশাল দেশ যে মূলতঃ এক এবং অভিন্ন এই পরিব্যাপ্তি বোধ দেশের জনগণের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে একাত্মবোধের একটা বিমূর্ত চেতনা শতাব্দীকাল ধরে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ-গুলির মধ্যে একটা সূত্রের মত বিরাজ করছে এবং তা অতীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক জাতি হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছে, কিন্তু তেমন করে আজকের আর্থিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের গতির দ্রুততার দরুণ ঐ সুক্ষ্ম অবচেতন অনুভব দেশকে একসূত্রে ধরে রাখতে ঠিক যথেষ্ট নয়। ঐ বিমূর্ত অনুভবকে বাস্তবানুপথে পরিচালিত করে একতা ও একাত্মতাবোধের উন্মেষ ঘটানোর জন্য কোন মতবাদ

খাড়া করেন নি ভারতের নেতৃবৃন্দ । এই প্রয়োজনটা তখনো দেখা দেয়নি । কিন্তু আজ এমন একটা মতবাদ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী । এই মতবাদ সাধারণ মানুষের কাছে, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, সহজ বোধ্য হওয়া চাই এর যথার্থতাও পরিপূর্ণতার যুক্তি একান্তই সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করার সময় আমাদের জাতীয় জীবনের সেই সব দুর্বল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যা বিচ্ছিন্নতাকামীদের হাতিয়ারে পরিণত হয় । আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাম্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাচুর্যের অঞ্চলগত বিভিন্নতার মধ্যে নিহিত এবং ঐতিহাসিক কারণ ও যথেষ্ট সহগমন করে । এই যে ব্যাপার তা কিছুটা অনিবার্য এবং কিছু পরিমাণে অডিপ্রেতও বলা যায় । যে অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে গড়ে উঠে না । সেখানে অসমতা বৈষম্য জন্ম নেয় এবং তার জন্মাই দেখা দেয় সংঘর্ষ ও পীড়ন । বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শুরুতেই যা বলে সোচ্চার হয়ে উঠে তা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলকে অবহেলা করা হচ্ছে, এবং একটি অঞ্চল দেশের অন্য অংশের দ্বারা শোষিত হচ্ছে বলে প্রচার করা । সংবাদ সংস্থা প্রভৃতি গণপ্রচার মাধ্যম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ও পরিসংখ্যানকে নজির হিসাবে তুলে ধরে ঐ ধারণাকে জোরদার করে তোলে । এই যে কাজ, তা খুবই সহজ । প্রকৃতপক্ষে, তুলনা মূলক হিসাবে দাখিল করে এটা দেখান যায় যে ভারতবর্ষের একটি অঞ্চল দেশের বাদবাকী অংশের দ্বারা শোষিত হচ্ছে । বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের শিথিল সারবত্তাহীন মানসিকতা সর্বত্র বিরাজ করছে । এটা একটা দুট চক্রের কুকর্ম এ থেকে জন-দ্বার্থ বিরোধী—পরস্পর বিরোধী এক সংঘাতিক মানসিকতা গড়ে উঠছে । কিছু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় । এই প্রশ্নের উত্তর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় । এখানে উল্লেখযোগ্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি

সব সময় অসম উন্নয়নের কথাই বলে, কিছু প্রকৃত উন্নয়নের জন্যই যে উন্নয়ন এই কথা বলে না। ভারতের জনগণের কর্মসংস্থান, খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদির মত মৌলিক বিষয়গুলির বিলি বণ্টনের জন্য ন্যূনতম আর্থিক অগ্রসরতার দাবী তারা কখনো করে না। কাজেই সংহতি গড়ে তোলার জন্য এই মৌলিক প্রয়োজন-গুলি যাতে আদায় করা যায় তার জন্য কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেবল অসমতা বিলোপের চেষ্টা অর্থহীন প্রয়াসে পর্যবসতি হবে। কিছু যা সার্থক হতে পারে তা হচ্ছে ন্যূনতম আর্থিক অগ্রসরতার মান অর্জনের সহায়তা করা, এবং এটাই হচ্ছে উন্নয়ন ও সংহতি অর্জনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য সম্পর্কে যে সব বাঁধা বুলি চালু আছে তা মানুষকে কম আকর্ষণ করে না। চালু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়, নিঃসহায়তা এবং স্বকীয়তা বিলোপের আশংকা মানুষকে তার আজন্ম লালিত সংস্কৃতির সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। যদি সে ভয়শূণ্য হতে পারত তবেতো তার সম্মুখে তথাকথিত সংস্কৃতির অচলায়তন ধ্বংসে পড়ত। মানুষের চিন্তা ধারা ও দৃষ্টির ব্যাপ্তি যখন ভয়ের কাছে আত্মসম্পর্পণ করে তখনই মানুষ তথাকথিত সংস্কৃতির পদানত হয়, শৃংখলিত হয়। পক্ষান্তরে ঐ ভয় মুক্ত হতে পারলেই মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রসারতা আসে, এবং তখনই তার পক্ষে সংস্কৃতির ধারাকে পাল্টাতে শক্তি যোগায়। বদ্ধ সংস্কৃতির অর্থই হচ্ছে রক্ষণশীলতা। কিছু রক্ষণশীল মানসিকতা ঐখান থেকেই জন্ম নেয়। অতএব, আমাদের অনুন্নত সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের সমস্যার মূল। অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা যতই মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসে, সেই মানুষের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিশ্চল এবং গতিহীন হয়ে উঠে। বিচ্ছিন্নতাকামীরা আমাদের জাতীয় জীবনের এহেন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত চাতুর্যের

সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে। ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে মানুষের মধ্যে উন্মত্ততা সৃষ্টির জন্য গলা ফাটিয়ে ফেলছে যারা, তারা কিন্তু সেই ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের উপযোগী করার কোন প্রচেষ্টাই করে না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার তিন দশক পরেও বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রে চাহিদা মিটানোর মতো যথেষ্ট বিকাশ ভারতীয় ভাষাগুলির হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিকাশ হীনতা। অনগ্রসরতা জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দৃষ্টি ভঙ্গীকে সংকীর্ণ করে তোলে। অতএব, জাতীয় সংহতির জন্য যা করা দরকার তা হচ্ছে দেশবাসীর মন থেকে ভয় দূর করা এবং সংস্কৃতির ধারাকে অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া যাতে করে আশা আকাংক্ষা সংহত ও সুবিঘ্নাস্ত হয়ে উঠে।

ধর্ম ও জাত পাত সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেখা যায় যে, সংস্কৃতি বিকাশহীনতায় ভুগলে তা থেকেই জন্ম নেয় এমন এক ধর্ম যা সংঘর্ষের উৎস হয়, এবং জাতপাত হয়ে পড়ে অত্যন্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। সুতরাং জাতীয় সংহতিকামী মতবাদ গড়ে তোলার সময় এই সব খতিয়ে দেখতে হবে তা থেকেই নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা দরকার।

(১) অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—ভারতের কোন অংশই নিজে একক ভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। জনগণের মৌলিক চাহিদা এভাবে মিটান সম্ভব নয়, তেমনি এভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠবে না। খণ্ডিত ভারতবর্ষ অনিবার্যরূপে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

(২) রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—খণ্ডিত ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষই সম্ভব করে তুলতে পারে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের শক্তিকে সুদৃঢ় করতে ।

- (৩) সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা—ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধ্যেই সুশ্রু আছে সেই বস্তুজাত বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধিসত্ত্বাত প্রেরণা যা জনমানবের ভীতি দূর করতে পারে এবং বর্তমান অনুন্নত সংস্কৃতিকে উন্নত ও মানবিক সংস্কৃতিতে রূপায়িত করতে পারে ।

জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে এক মতবাদ—অর্থাৎ মৌলিক একতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে একটা আদর্শের কাঠামো খাড়া করানোই যথেষ্ট নয় । একই সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

এখানেই গণপ্রচার ও শিক্ষামাধ্যম নিয়ে আলোচনার কিছু দৃষ্টকার আছে :—

(ক) জনগণের ভাবাবেগকে জাগাতে রূপ দিতে এবং দিক নিরূপণ করতে সংবাদ সংস্থার এক বিশেষ ভূমিকা আছে । কোন বিশেষ বিশেষ কলেবরে উপস্থাপিত করা যায় । দুর্ভাগ্যবশতঃ সংবাদ সংস্থাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ফাঁদে ধরা দেয় । বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপস্থাপিত ঘটনা সমূহকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার পরিবর্তে তাদের বক্তব্যগুলিতে যথার্থতার ছদ্মবেশ পরিয়ে দেয় । আর্থিক বৈষম্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমূহের সংযোজন কোন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং আধিপত্যের ভীতি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে সংবাদ সংস্থাগুলির উচিত হলো গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা । সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াসে সংবাদ ও গণপ্রচার মাধ্যমে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সংবাদ প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি সুচিহ্নিত মতামত ও সুবিন্যস্ত চিন্তামারা প্রচারের সহায়ক হয় । এই কাজে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে । জাতীয় সংহতি অর্জনের পথে যে রাজনৈতিক সমস্যাাবলী আছে তা একমাত্র সংবাদ সংস্থা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে

জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়। বস্তুতঃ প্রচারমাধ্যম স্বাভাবিক কারণেই রাজনীতি থেকে মুক্ত নয়।

(খ) কৃষি ও সংস্কৃতি জাতীয় সংহতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। সংস্কৃতির প্রচারের জন্য এবং সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বেতার, দূরদর্শন, মঞ্চাভিনয়, ছায়াছবি প্রভৃতিকে নতুন ভাবধারায় সজ্জিত ও পূর্ণগঠিত করতে হবে। ঐক্য ও সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তা সংস্কৃতির মান উন্নয়নের সমস্যার যথার্থই সমতুল্য। ছায়াছবি, নাটক, সাহিত্য-শিল্প কর্মে নিয়োজিত প্রথম সারির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করতে হবে এমন একটি দল যাদের শিল্প-কর্ম রচনা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সূত্র হচ্ছে, সেই সঙ্গে হবে সংস্কৃতির মান উন্নত। যদি মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও সৌন্দর্য পিপাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছবি তৈরী হয়, নাটক রচিত হয় তবে তা রসধর্মী ও সুরাচিসম্পন্ন রচনায় পরিণত হতে পারে। সত্যজিৎ রায়, মুনাল সেন, শ্যামবেনেগাল, গিরিশ কনরাড, বাসু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ চিত্র পরিচালকদের কাছে এ ধরনের মানবিক আবেদন সম্পন্ন সুন্দর ছায়াছবি তৈরির কথা বলা যেতে পারে। এতে সংস্কৃতির মান উন্নত হবে, সংহতিও গড়ে উঠবে এর জন্য ১৫-৩০ মিঃ দৈর্ঘ্যের ছবি করা বাঞ্ছনীয়—যা স্থানান্তরে বহনের উপযুক্ত এবং আর্থিক দিক থেকে উপযোগী। নাটক বা ছবির বিষয়বস্তু কি হবে তা স্থির করা সর্বাপেক্ষা জরুরী, তার পরেই আসছে কি ভাবে ঐ বিষয়টাকে উপস্থাপিত করা হবে। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এ বিষয় স্থির করতে হবে। তারপর তৈরী ছবি, নাটককে বেতার, দূরদর্শন ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর দ্বারা যতটা বেশী সম্ভব প্রচার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, বেতার দূরদর্শন, ছায়াছবি, যাত্রা ইত্যাদি পরিকল্পনা সহকারে প্রচারমাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী। এই সব বিষয়কে সুসম্পন্ন করার জন্য একটা বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচী রচনা করতে হবে। এইখানেই সমাজের সর্বস্তরের লোকদের—বিশেষতঃ প্রকৃতি ও

সমাজ বিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্থপতি এবং ঐতিহাসিকদের সর্বিশেষ ভূমিকা ও ইতিকর্তব্য আছে।

(গ) আমাদের দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন জি-এস-আই এর মত সংস্থা দেশের ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, খনিজ সম্পদ, নদী ও ভূ-স্তরে জলের উৎস, শক্তির সান্ত্বাব্যতা, বনজ সম্পদ এবং মাটির প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে প্রচার করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে সময় সময় কিছু পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিলি করা। বলতে চাই ঐ সব তথ্য সুন্দর ও সহজ বোধ্যভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ বসবাস করছে সে সম্বন্ধে একটা মূর্ত ধারণা গড়ে উঠলে তা জাতীয় ঐক্য অর্জনের সহায়ক হবে। ভূ-কম্পন, আগ্নেয় গিরি, ঝড় প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূ-তাত্ত্বিক সংবাদ বৈজ্ঞানিক মানবিকতা গড়ে তুলতে পারে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে জি-এস-আই এ বিশেষ কর্ম পরিষদ গড়ে তোলা যায়।

মানুষের উন্নতি ও বিকাশ সাধনের যাত্রা বিরোধী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাদের প্রতিহত করতে নৃতত্ত্ববিদের ভূমিকা আছে। কারণ মানুষের বিধিবদ্ধ আচার অভ্যাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নৃতত্ত্বের শিক্ষাক্ষম। সংহতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য জি-এস-আই এর মতো মানুষের বিকাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদদেরও সর্বিশেষ করণীয় আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন রূপ তারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে। কালের বিবর্তনের স্রোতেও ভারতীয় কৃষ্টি মূলতঃ একেবারে বাণী বহন করে চলেছে। এই পরিকল্পনাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা চলে, যেমন যন্ত্রপাতির ব্যবহার

শিক্ষা, স্থাপত্য, সংযোগ ব্যবস্থা, সমরসত্তার, কারিগরী দক্ষতা, অলংকার, সাজসজ্জা এবং অঙ্কন শিল্প প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে সমান্তরাল গবেষণা হলে তবে তা থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে।

অনৈতিহাসিক সংস্কার ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকদের সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। ইতিমধ্যেই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার ধাক্কাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার কাজে নেমে পড়েছেন। ইতিহাসের পঠন-পাঠনের শিক্ষকদের পূর্বতন ধ্যান ধারণার এবং প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে নব-মূল্যায়নের যে পরিকল্পনা NUERT গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্বোপরি এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যার দ্বারা আমরা সবরকম কুসংস্কার এবং বিকাশ-বিরোধী আবহাওয়াকে প্রতিরোধ করতে পারি, একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে পারি। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিজ্ঞানের সকল শাখার সাহায্যে ভিন্নমুখী শিক্ষাক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, একামুখী হওয়া।

উপসংহারে, একথা আমাদের অতি জরুরী মনে রাখতে হবে যে জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলি মূলতঃ কতকগুলি মানবিক সমস্যা মাত্র। এতে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে বেড়ান শুধু অসার্থকই নয়, দোষাবহও বটে। এটা অত্যন্ত বিদ্রাষ্টিকর ও বিপজ্জনক।

ধরা যাক আসামের কথা। বর্তমানে আসামে যে পরিস্থিতি চলছে এবং সেখানে যে সব রাজনৈতিক দল আছে তাদের অস্তিত্বের অসারতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অভূতপূর্ব সামাজিক—তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তারা কত অপরাগ এবং অশক্ত। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বল প্রয়োগের কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে 'বলপ্রয়োগ' যাতে অভিসন্ধিমূলক হয়ে না পড়ে তুর জনো সতর্ক হতে হবে এবং তা যেন রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে ছাড়িয়ে না যায়।

বাস্তবিক পক্ষে শক্তিশালী সরকার বলপ্রয়োগ করেন অত্যন্ত সীমিত ভাবে ।

এমন কি বিদ্রোহসূচক পরিস্থিতিতে, বলপ্রয়োগ যেখানে অপরিহার্য, সেখানে তা এমন চতুরতার সঙ্গে করতে হবে যেন শুধু দলীয় প্রচার কার্য, মতবাদ প্রচার, আলোচনার মাধ্যমে জয় করা এবং প্রকৃত বিক্ষোভের সমাধান লাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণক হিসাবে কাজ করে । এই উদ্দেশ্যে যে কৌশল অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার । অতীত অভিজ্ঞতাকে খতিয়ে দেখা যাক । এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রস্তাব হচ্ছে যে সব মানুষ বা দল স্পষ্টতঃ একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হয়, যারা জাতীয় সংকটের অভিন্নতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং যারা মোটামুটি একই মঞ্চ থেকে এই সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ তারা একে অপরের উপর যেন রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করেন । সংগ্রামী মানুষের ঐক্য সাধনের চেষ্টা যারা করছেন সেই সব রাজনৈতিক দল যাতে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন সেই জন্য গঠনমূলক সমালোচনা, বিচার বিবেচনা এবং উপযুক্ত প্রস্তাব করা যেতে পারে । এরই ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে ২২শে জুন 'শ্রীনগর ঘোষণা' রচিত হয়েছিল । ইতিমধ্যে বহু দিন গত হয়েছে, বিলাম —বিপাশা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে । আজ জুলাই ১৯৮২ সাল । ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অবশ্যই আরো অভিজ্ঞ হয়েছেন । তাঁরা জানেন অতীতে আলীগড়, জামশেদপুর, মোরাদাবাদে যা ঘটেছে, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরায় যা হচ্ছে এবং অতি সাম্প্রতিক কালে বিহারশরীফ, ঝাড়গ্রামে যা হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যা ঘটতে পারে তা শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয় । সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পেন্টাগন ও তার দোসরদের কার্যকলাপ ও কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত ঘটনাকে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে । কারণ এই বিশালদেশ ভারতবর্ষ তার স্থিতিশীলতা হারাক এটাই পেন্টাগনও তার উন্নত দোসররা নিশ্চিত ভাবে কামনা করে ।

জাতীয় ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং প্রতিশ্রুতির দরুণ এহেন সংঘাত মূলক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। তাই আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দিয়ে সংশ্লেষিত করতে হবে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধকে বিশ্বমানবতাবোধের পরিপূরক করে তুলতে হবে। এই অভিন্নতা ও ঐক্যবোধের ধারণাকে সমৃদ্ধ করার জোরদার করার অন্যতম পন্থা হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের কাহিনী স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ করতে হবে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে উপজাতিদের অভ্যুত্থানের কথা, মনে রাখতে হবে চল্লিশ দশকের সেই রোমহর্ষক বিদ্রোহের কথা—যে বিদ্রোহে নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং বিমানবাহিনী অংশগ্রহণ করেছিল।

---

বাস্তবিক পক্ষে শক্তিশালী সরকার বলপ্রয়োগ করেন অত্যন্ত সীমিত ভাবে ।

এমন কি বিদ্রোহসূচক পরিস্থিতিতে, বলপ্রয়োগ যেখানে অপরিহার্য, সেখানে তা এমন চতুরতার সঙ্গে করতে হবে যেন শুধু দলীয় প্রচার কার্য, মতবাদ প্রচার, আলোচনার মাধ্যমে জয় করা এবং প্রকৃত বিক্ষোভের সমাধান লাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণক হিসাবে কাজ করে । এই উদ্দেশ্যে যে কৌশল অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার । অতীত অভিজ্ঞতাকে খতিয়ে দেখা যাক । এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রস্তাব হচ্ছে যে সব মানুষ বা দল স্পষ্টতঃ একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হয়, যারা জাতীয় সংকটের অভিমুখতা সম্বন্ধে ঔয়কিবহাল এবং যারা মোটামুটি একই মঞ্চ থেকে এই সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ তারা একে অপরের উপর যেন রাজনৈতিক ফায়দা ভোলায় চেষ্টা না করেন । সংগ্রামী মানুষের ঐক্য সাধনের চেষ্টা যারা করছেন সেই সব রাজনৈতিক দল যাতে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন সেই জন্য গঠনমূলক সমালোচনা, বিচার বিবেচনা এবং উপযুক্ত প্রস্তাব করা যেতে পারে । এরই ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে ২২শে জুন 'শ্রীনগর ঘোষণা' রচিত হয়েছিল । ইতিমধ্যে বহু দিন গত হয়েছে, বিলম্ব —বিপাশা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে । আজ জুলাই ১৯৮২ সাল । ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অবশ্যই আরো অভিজ্ঞ হয়েছেন । তাঁরা জানেন অতীতে আলীগড়, জামশেদপুর, মোরাদাবাদে যা ঘটেছে, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরায় যা হচ্ছে এবং অতি সাম্প্রতিক কালে বিহারশরীফ, ঝাড়গ্রামে যা হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যা ঘটতে পারে তা শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয় । সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পেন্টাগন ও তার দোসরদের কার্যকলাপ ও কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত ঘটনাকে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে । কারণ এই বিশালদেশ ভারতবর্ষ তার স্থিতিশীলতা হারাক এটাই পেন্টাগনও তার উন্নয়ন দোসররা নিশ্চিত ভাবে কামনা করে ।

জাতীয় ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ এহেন সংঘাত মূলক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। তাই আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দিয়ে সংশ্লিষ্ট করতে হবে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় স্বাভিমানতন্ত্র বোধকে বিশ্বমানবতাবোধের পরিপূরক করে তুলতে হবে। এই অভিন্নতা ও ঐক্যবোধের ধারণাকে সমৃদ্ধ করার জোরদার করার অন্যতম পন্থা হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের কাহিনী স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ করতে হবে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে উপজাতিদের অভ্যুত্থানের কথা, মনে রাখতে হবে চল্লিশ দশকের সেই রোমহর্ষক বিদ্রোহের কথা—যে বিদ্রোহে নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং বিমানবাহিনী অংশগ্রহণ করেছিল।

---

# গান্ধীজীর আজকের ভারত ও আমাদের শপথ

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি ৫-১৮ মিঃ -এ নাথুরাম গডসের হাতে প্রাণ দিলেন। এই ৭৪ বছরের কর্মময় জীবনের মধ্যে মোহনদাস হয়ে উঠেছিলেন গান্ধীজী, জাতির পিতা, দক্ষিণ আফ্রিকার কালো আদমির অধিকার রক্ষার জন্য ( ১৯০৬ ) যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁর পরিক্রমা শুরু হয়েছিল — খরা চম্পারন, বারদৌলি, আহমেদাবাদ (১৯১৮-২২) অসহযোগ-খিলাফত ( ১৯২২ ) লবন আইন ( ১৯৩০ ) রাজকোট ( ১৯৩৮ ) ভারত ছাড় ( ১৯৪২ ) বিহার, নোয়াখালি, কোলকাতা ও দিল্লীর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ( ১৯৪৬-৪৭ ) সে পরিক্রমা শেষ।

গান্ধীজীর ব্যর্থতা ও সাফল্য সব কিছু মিলিয়েই আমাদের জাতীয়তাবাদের সুবিশাল বর্ণাঢ্য ধারার ও মহিমাময় আদর্শের মহান কারিগর হিসাবে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা — হো-চি-মিন নয়াদিল্লীস্থিত টাইমস্, অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন “ গান্ধীজী, তিনি তো আমাদের সকলের গুরু ” — তাঁর এই মন্তব্য কোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে সমস্ত মানুষের সংগ্রামী ঐক্য-সাধন ও স্বাধীনতার বাণীকে নিপীড়িত মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে মূর্ত করার কাজে গান্ধীজী আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভূমিকায় ব্যর্থতা ছিল ও ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্টতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে

দেখতে গেলে তিনি যে ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় সংহতির গুরুত্ব ও সমস্যাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন—এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। তাইতো তিনি জাতির পিতা হিসাবে কোটি কোটি মানুষের কাছে অভিনন্দিত। এই কারণেই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর পথচলার দিকদিশারী।

গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহান রূপকার। তিনি যে মহাজাতির স্বপ্ন দেখেছেন : ১। সে হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম-পারসী-খ্রীষ্টানের মিলিত মহাজাতী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন ভাষায়, ভাবে, সংগীতে ও সংস্কৃতিতে। জহরলাল একে রূপায়িত করার সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রী ও অগণিত ধর্মনিরপেক্ষতার পূজারীরা তার পাশে ছিলেন।

২। গান্ধীজী তাঁর নিজস্ব ধরনে সবচেয়ে শোষিত মানুষকে চিহ্নিত করেছিলেন। 'হরিজন' অর্থাৎ ভগবানের সন্তান বলে, ভারতবর্ষের মতন ধর্মপ্রাণ দেশে তিনি এই আঙ্গিকের আশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন।

এই শোষিত মানবগোষ্ঠী কোটি কোটি নিরক্ষর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বনজঙ্গলে—পর্বতের বন্দরে বন্দরে গুহার কোটি কোটি কোটি 'গিরিজন' নিয়ে অধিবাসী সবাই আজ ভগবানের সন্তান দলের মধ্যে গণ্য"।

কি কাজ—কাদের নিয়ে মহাজাতি—কাদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম—এই সমস্যা নির্ধারণে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাই তিনি বর্তমান ও ভাবীকালের সংগ্রামের ঐতিহ্য বাহনকারী দীপশিখা তাঁর জীবন দানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ব্রত সমাপন করেছেন। আমাদের জন্য রেখে গেলেন অসমাপ্ত সংগ্রামের গুরুভার"।

২২শে মার্চ ১৯৭৭ সাল বর্তমান শাসকদল গান্ধীজীর পবিত্র নামে শপথ নিলেন—তার অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ করবার। কিন্তু গত ছয়মাসে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে—দেখা যাক সারা দেশে—

(১) হরিজন গিরিজনদের ওপর চলেছে অবর্ণনীয় অত্যাচার মধ্যপ্রদেশের খবর—বেতুলে দুইজন আদিবাসী বালিকার উপর বলাৎকার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের আর এস এস মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেননি। অথচ এরা বার বার ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ “মহারাস্ট্রের পারভানী জেলায়—নিঃস্ব কৃষক রমণী খাবার চাওয়ার অপরাধে উলঙ্গ করে অপমান করা হয়”। অন্ধ্রপ্রদেশ “৭৭ সালেও ৪০ টাকা খণ্ড পরিশোধে অপারগ হরিজন রমণীকে শূকরের বিষ্ঠা জোড় করে খাওয়ান হয়” তামিলনাদে কাঞ্চি কাচারি গ্রামে জ্যোত্স মানুষকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা এখনো ঘটছে। কর্ণাটক জেলার চিক-মাগালোর ও শিমোগাতে মারাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পঙ্গু করার জন্য। অমৃতসরের বাথগ্রামে ৪ জন হরিজনকে গুলি করে হত্যা করেছে জমিদারের গুণ্ডারা, তার মধ্যে একজন ছিলেন অন্তঃস্বত্বা মহিলা। গত কয়েক বছর পূর্বে তামিলনাদে খিলাঙেন মানু গ্রামে হরিজনদের একটি গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে কুডাপ্পা জেলায় জমিদারের লোকেরা ১২৩টি হরিজনদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল—কারণ তারা সরকার কর্তৃক ঘোষিত নতুন বেতন নীতি অনুযায়ী বেতন দাবি করেছিল। মধ্যপ্রদেশে জমিদারের গুণ্ডারা হরিজনদের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। একজন মধ্যবয়সী মহিলাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। গুজরাটে হরিজনদের বস্তি জ্বালিয়ে দুইজন হরিজনকে বর্শাবিক্ত করা হয়। তাদের অপরাধ তারা খরতাপে দগ্ধ হয়ে

কুয়ো থেকে জল তুলেছিল। বিহারে মেহলুর গ্রামে পুলিশের সাহায্যে বস্তির সমস্ত হরিজনদের তাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ করে। গত জুন মাসের শেষে বেলচি গ্রামে ১১ জন হরিজনকে পুড়িয়ে মারা হয়। কয়েকদিন পর পাখাড়্রাতেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এই নিয়ে ভারতজুড়ে দলমতনির্বিশেষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের আগস্ট মাসের দিকে মেদিনীপুর জেলার নইপুর গ্রামে ক্ষেতমজুর কুদিরাম ঝাকে নৃসংস্ভাবে হত্যা করা হয়। বীরভূম জেলায় মাহতার গ্রামের ভাগচাষী নারায়ণ বিশ্বাসের অপরাধ তিনি আদালতের বিচারে ফিরিয়ে পাওয়া জমিতে চাষ করেছিলেন। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হল। সারা ভারতজুড়ে গান্ধীজী যাদের ভগবানের সন্তান আখ্যা দিয়েছিলেন সেই হরিজনদের ও গিরিজনদের ওপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সময় এসেছে।

(২) গান্ধীজী যে জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলমান “আন্তরিক ঐক্যের” ভিত্তিভূমির উপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন আর এস এস-এর সর্বাধিনায়ক গোলওয়ালকারজী ও তার প্রধান ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাদের প্রধান বক্তব্য হল (ক) “ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ—মুসলমানরা এখানে বিদেশী”! (খ) “হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয় তেমন কিছু হয় নি। ৭০০ বছর ইতিহাস শুধু হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের ইতিহাস।” (গ) মুসলিমরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে। (ঘ) সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল। ১২০০ খ্রুষ্ঠাব্দ থেকে। আধুনিককালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা এই মতামতগুলি দ্রাস্ত প্রমাণ করেছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক নির্দেশনামায় ভারতের কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে

বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পশ্চাতে বিখ্যাত জনসংঘ নেতা নানজী দেশমুখ ও তার পরামর্শদাতা ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের প্রভাবের কথা শোনা যায়। ডঃ রমীনা মাপরের মধ্যযুগের ইতিহাস ডঃ বিপন চন্দ্রের আধুনিক যুগ ও ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে প্রভৃতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—এদের মতে মুসলিম ও বাম ঘোঁষা ইতিহাস। সরকারের এই নির্দেশ ভারতবর্ষে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল—মহাজাতীয়তা-বাদের পরিপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবেই।

মতাদর্শের এই সংগ্রামে নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই—এক দিকে গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ ও জহরলাল—অন্যদিকে গোলওয়ালকার-রমেশ মজুমদার ও রোসেন বার্গ ও হিটলারের অনুগামী—আর এস এস দল।

বস্তুত আর এস এস এখন রাজনৈতিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী। ৫ লক্ষের বর্তমান সভা সংখ্যা তারা ৫০ লক্ষে নিয়ে যাবে এক বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের ১১ হাজার থেকে তাদের সভা সংখ্যা হবে ২৫ হাজার।” উত্তরবঙ্গ-আসাম-নাগাল্যান্ড-মেঘালয় প্রভৃতি জায়গায় তাদের শক্তি সংহত হচ্ছে। উত্তর মধ্য ও পশ্চিম-ভারত তাদের প্রায় করতলগত। পুলিশ সেনাবাহিনী, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা ও বিদেশের কূটনৈতিক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অধিকারে। তাদের এই প্রচণ্ড শক্তিবৃদ্ধির দাপটে জনতার গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার অংশ অসহায় বোধ করছেন অনেক বামপন্থী আর এস এসদের রাখীবন্ধন উৎসবে যোগদান করে তাদের হৃদয় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মুসলিম ও হরিজনদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আর এস এস তাদের মত বদলিয়েছে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। “এদের পরিকল্পনা আরও নিখুঁত, ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী।” এই

পটভূমিকায় গান্ধীজীর স্বপ্নকে রূপায়িত করার পবিত্র দায়িত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে—যারা গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রে আদর্শের অনুরাগী তাদের তাঁরা যে কোন দলের হোন বা-যে কোন নির্দলীয় মতেরই হোন না কেন। নিপীড়িত হরিজন ও গিরিজনদের সংগ্রাম আর ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র সংগ্রাম— একসূত্রে গাঁথা।” আজকের শপথ এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার।

---

“শেষ পর্যন্ত, আমি এক বিশ্বে বিশ্বাস করি। এ আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে একটা সময় আসবে যখন মানুষ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও নিজেদের অপরের থেকে পৃথক বলে ভাববে না। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে এমনকি সবচেয়ে পশ্চাদপদ জাতি গোষ্ঠীও নিজেদের সংস্কৃতি ও রীতি নীতি সম্পর্কে গর্ববোধ করে; কিন্তু এর ফলে তাদের নিজেদের ভাল ভারতীয় মনে করার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।”

ইন্দিরা গান্ধী

---

## জাতীয় ঐক্য রক্ষার পবিত্র শপথ

১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চের সভা নির্বাচন আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অর্জনের সংগ্রামে এক সন্ধিকাল। পূর্বতন সরকার যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে (১) সাম্প্রদায়িকতাবাদ (২) আঞ্চলিকতাবাদ (৩) ভাষাগত উগ্র সংকীর্ণতাবাদ (৪) জাতিভেদ (৫) ক্রমবর্ধমান সামাজি বৈষম্য এবং অন্ধ গোড়ামী ও সংস্কার বিমুখ ভাবধারার প্রাবল্য প্রভৃতি বিভেদকামী শক্তিগুলির মোকাবিলা করার জন্য শুধু আইন শৃংখলাগত সমাধানের বিষয়টি উপস্থিত হয়নি সেই সংস্কে এই জরুরী অবস্থা সংবিধান বহির্ভূত স্বৈরতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন এক ধরনের বিকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা করে যা জাতীয় ঐক্যের পথে ক্ষতিকর এবং যে বহু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চল জাতীয়তাবাদের উদগাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী সেই জাতীয়তাবাদে উদ্ধুদ্ধ আমাদের হৃদয়ের সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রে এই বিকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে যখন গণতন্ত্র বিরোধী ঝোঁকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক প্রবল আলোড়ন ভারতের উত্তরাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত এলাকায় গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে তখন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, অঞ্চল, জাতি এবং শ্রেণীর অবরোধ ভেঙ্গে যে শুভ ভাবাবেগ উৎসারিত হয়েছে তাকে সুসংহত করা উচিত এবং আমাদের জনগণের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ঐক্য ও তার সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে একটি ইতিবাচক পথ-নির্দেশক থাকা আবশ্যিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তবু দেশব্যাপী তরঙ্গ স্রোত থেকে উদ্ভূত এই মূল্যবান ভাবাবেগের সম্পদকে অক্ষত রাখার জন্য সামান্য প্রচেষ্টাই নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ১৯৬২ সাল থেকে সংগ্রামের মাধ্যমে যে সুফলগুলি অর্জিত হয়েছিল

তাকে আরও এগিয়ে নেয়ার কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়নি। একের পর এক অশুভ ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে।

(১) একটি আধাসামরিক সেন্সাবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছে। এই সংগঠন থেকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে মুসলমানগণ বিদেশী এবং তারা বিশ্বাসঘাতক; তাদের ভারতীয় হতে বলা হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে তাদের লক্ষ্য হল হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং আর্যজাতির আধিপত্য প্রচার করা। তারা দাবি করেছে যে এ বছরের মধ্যে তারা তাদের ৫০ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের কোটা পূরণ করবে। এটা সবাই জানেন যে তারা তাদের আগেকার সামাজিক দর্শন এবং তারা মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি অহিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ পরিত্যাগ করেনি। তারা আরও দাবি করে যে তারা আমাদের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে। তারা প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবং আংশিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। আধা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে তারা সম্প্রতি গণসংযোগের বিস্তৃত কেন্দ্রগুলি দখল করেছে এবং তারা উচ্চমানের সূক্ষ্ম ও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কৌশল অর্জন করেছে। তাদের প্রচণ্ড আঘাতের কেন্দ্রস্থল হল দিল্লী স্কুলের মান অনুসারে সুলিখিত ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলি। এই ইতিহাসগুলি লিখেছিলেন সমসাময়িক কালের স্বল্প-সংখ্যক বিদ্বজ্জনের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েক ব্যক্তি। তাঁরা হলেন ডঃ বি. পি. চন্দ্র, ডঃ রমিলা থাপার, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকে বানচাল করার জন্য এটা হল এক নিরবচ্ছিন্ন ও পরিকল্পিত আক্রমণের সংকেত—শিক্ষার এই ভিত্তি পূর্বতন সরকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্যতম এক অমূল্য সম্পদ। এবং এর রয়েছে সুদূর প্রসারী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ফলাফল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলীমগণ এর ফলে অস্থির মনোভাব পোষন না করে পারেন না। যে পর্যন্ত

আর এস এস প্রভাবিত জনতা সরকার ক্ষমতাসীন থাকছে সে পর্যন্ত হয়তো ঘন ঘন দাঙ্গা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। মুসলীমগণ সাধারণ ভাবেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার মনোভাব প্রায় হারিয়ে ফেলছে। জাতির স্বার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করাও তাদের পক্ষে ক্রমে দূর হতে উঠছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ও সর্বদাই রয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে পৃথক হতে পারে কিন্তু ভারতে প্রাণ কেন্দ্রের প্রধান ব্লকগুলির ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমের প্রভাব নিতান্তই সীমিত। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে (শিয়া-সুন্নি) এবং উত্তর প্রদেশের অন্যান্য স্থানে (বারানসীর) দাঙ্গা থেকে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় হাওয়া কোন দিকে বইছে। বিগত দশহাজার দিনে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ৫টি ঘটনা ঘটে গেছে।

(২) এই অঞ্চলে দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে সরকারী ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হিন্দী ব্যবহার ভারতের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে এধরনের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হবে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা। এ ভাবে দূষিত ও অশুভ ব্লকের সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(৩) উর্দুকে একটি প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব দুর্ভাগাজনক—ফলে উর্দু ভাষাভাষী বিশেষ করে মুসলীমদের আরও বেশী বিক্ষুব্ধ করে তোলা হচ্ছে।

(৪) নেপালী, সিকিমি, নাগা, মিজো, খাসি, গারো প্রভৃতি বিশেষ করে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অধিজাতিদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ঔপনিবেশিক ধাচে কতিপয় আমলা ও কায়দা স্বার্থবাদীদের তাঁবে রাখার কূটনীতি থেকে উদ্ভূত এর হৃদয় হীন ব্যবস্থার বদলে সত্যিকারের গণমুখী নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে করে ভারতের প্রধান স্রোত ধারার সঙ্গে এদের সংহতির পথ উন্মুক্ত হয়।

(৫) সমতল ও পাহাড় এলাকার হরিজন ও গিরিজান বলে অভিহিত ক্ষেতমজুরদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় এই ক্ষেতমজুরেরা লোভীকুলাকদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে বিপত মার্চের নির্বাচনের পর তারা স্বৈরাচারী ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বেলচি ধরমপুরের ঘটনা সেই ১৯৬৯ সালের কাকি কাছারিয়ার পুনরানুষ্ঠি।

(৬) একটি কমিশনের অধীনে আইন গত গ্যারান্টি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়তা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হল একটি বলিষ্ঠ পথ-নির্দেশক সহ নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় অভিযান। এ বিষয়েও অন্যান্য ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি বিভেদকামী শক্তিগুলিকেই উত্তরোত্তর উৎসাহিত করে তুলবে। তাদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে গণপ্রচার মাধ্যমের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি—তাদের হাতে রয়েছে অর্থ আরও অনেক কিছু। সুতরাং যে কায়মী স্বার্থবাদীরা আমাদের জাতিকে পশ্চাদপদ ও বিভক্ত করে রাখতে চায় তাদের মোকাবিলা করার জন্য শুধু সমাজকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানোর অর্থই হচ্ছে বিভেদ কামী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করার পথে একটি পশ্চাদগামী পদক্ষেপ।

সুতরাং জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত একটি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশক নীতি নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় সংহতি আন্দোলন যে মতাদর্শগত ভাবধারা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে' এসেছে সেই ভাবধারা নতুন করে ঘোষণা করা আগের চেয়ে আজ আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের শৃংখলা ও স্ব-নিয়মানুবর্তিতা দেখে অনেক এমন দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে জাতীয় সংহতি প্রায় অর্জিত হয়ে গেছে এবং বিভেদকামী উপাদানগুলির দ্রুত অবলুপ্তি ঘটছে। এমন কি সাম্প্রদায়িকতাবাদ আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ হাশিয়ারীকেও অনেক মুখ্যমন্ত্রী

ও দিল্লীর পদস্থ আমলারা উচ্ছানীমূলক ও অনাবশ্যক বলে গণ্য করতেন। কিন্তু যদি আমরা এ সমস্যার গভীরে তাকাই তবে এই তথাকথিত সামাজিক শক্তি ও নিয়মানুবর্তিতাকে বাস্তবের পরিবর্তে উপর ভাসা বলে প্রতিপন্ন হবে কারণ এই শক্তি ও নিয়মানুবর্তিতা নতুন করে উদ্ভূত আমাদের সংস্কৃতিক চাহিদার অনুকূল কোন সদর্থক মতাদর্শগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(২) সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক আন্দোলন পুনরায় এক নতুন জাগরণ নিয়ে এসেছে। এটা “আমাদের জাতির দুর্বলতর অংশের মধ্যে” এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তারা অচিরেই তাদের নিজেদের এক নতুন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনোভাব অর্জন করবে। শিল্প ক্ষেত্রে তাদের সমভোগী মানুষের মতই তারাও তাদের নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক সাফল্যের অধিকারী হবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দলগুলির অতিআগ্রহ ও উৎসাহের ফলে তারা সহজেই পুরানো অন্ধ গোড়ামী ও প্রতিজ্ঞিয়াশীল ভাবধারার ও বিদেশী মিশনারী ও অন্যান্য উপভোগমুখী প্রচার মাধ্যমেরও শিকারে পরিণত হবে।

(৩) বর্তমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষকদের হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তারা প্রধানতঃ সামন্তবাদী ঔপনিবেশিক তথাকথিত বিকৃত বিশ্ব সংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে যায়। স্বভাবতঃই এই নতুন গ্রাম্য বুদ্ধিজীবীদের সামান্যই ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক ভিত্তি রয়েছে এবং তারা তাই সহজে সামন্তবাদী অন্ধ গোড়ামী অথবা পশ্চিমধাঁচের এক বিশ্বজনীন বিকৃত সংস্কৃতির শিকারে পরিণত হয়। প্রধানতঃ এর ফলেই ছাত্র, যুব শিক্ষকদের এক নতুন প্রজন্ম তাদের যে নিজস্ব মূল্যবোধ ও মানসিকতার জন্ম দিয়েছে তা তাদের নিজেদের জীবনে নিয়ে এসেছে অধৈর্য, হিংসা স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার চাতুর্য এবং সুবিধাবাদ।

এমনিভাবে বিভেদকামী শক্তিগুলি যাতে আমাদের বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, সেজন্য এক উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

(৪) যখন সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য বিভেদকামী শক্তিগুলি এক নতুন হাতিয়ার ও মর্যাদা লাভ করেছে এবং যখন সমাজবিরোধী জাতীয়তা বিরোধী ভাবধারা ও আচার আচরণ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শক্তির ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের নতুন মূল্যবোধকে ব্যাপক আকারে ও সুপরিকল্পিত ভাবে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা থেকে এটা মনে হয়েছে যে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত এবং এইসব জাতীয় অবক্ষয়কারী শক্তির সঙ্গে সহাবস্থান করে চলেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে জনগণ সংস্কারের বিরুদ্ধে যেচ্ছা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রাম পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে অবশ্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। আশা করা যায় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সরকারের সহজ দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। কিন্তু যুগযুগধরে মানুষের মনে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছেন—তাকে পরিশ্রুতি করা কিভাবে সম্ভব হবে জানিনা, বর্তমান সরকার কি সেখানে নিরপেক্ষ থাকবেন? প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ স্মরণ রেখেই আমি প্রস্তাব করছি যে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সংস্থা, ব্যক্তি এ কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংহতি ও মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় কমিটির মত এক বেসরকারী সংস্থা গঠন করে আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাবেন।

যখন গণতান্ত্রিক আচরণবিধির জয়লাভ আমাদের সামনে আমাদের অর্জিত সাফল্যকে জয়যুক্ত করার ও আমাদের মতাদর্শগত

সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলায় নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে তখন আর একটি মূহূর্তও নষ্ট না করে জাতীয় সংহতির আন্দোলনকে সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতে সুসংহত করার জন্য আবার আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে যাতে করে এই আন্দোলনের অচল অবস্থাকে গতিশীল করে তোলা যায়।

## জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বাঞ্চলে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে ভাষাগত ও আঞ্চলিকভাবাপূর্ণ সর্বনাশ স্বদেশানু-রাগের ধ্বজা ধরে দৈত্যের মত বিশাল পদক্ষেপে বিচ্ছিন্নতাবাদের অপদেবতা উপজাতি বিচ্ছিন্নতার চরম রূপ নিয়ে পরিভ্রমণ করে চলেছে। ভারতের কেন্দ্রাঞ্চলে এরূপ আরও অশান্ত উপজাতি এলাকা, বর্তমানে আর অনুমাননির্ভর নয়। সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ ধীর গতিতে হলেও দেশের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল এলাকা বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলগুলিতে, দাপ্তা সংঘটিত করার সুযোগের অপেক্ষায় অত্যন্ত ক্রতিকর কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহের চ্যালেঞ্জের সুযোগ নিয়ে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বে ফাটল ধরানো এবং সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে তচনচ করে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মনোমত ধাচে গড়ে তোলাই আজকের দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দেশের জনগণ যে সমস্যায় প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে নিমজ্জিত হয়েছে তার গভীরতা, ব্যাপকতা এবং গতি সম্পর্কে আমরা এখন অবহিত হয়েছি। জাতীয় সংহতি এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক

মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ বর্তমানে আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার বিষয় নয়, এক মহানজাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষারও ইহা একটি অপরিহার্য সত্য। কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিতান্ত দর্শক হয়ে দেশের এই ভাবনদশা উদ্বোধনের সঙ্গে অনির্দিষ্টকাল ধরে সহ্য করতে পারে না। জাতীয় সংহতি রক্ষা অভিযান একদল স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্যোগেও শুরু হয়েছে। এজন্য তাঁরা গত ২৮শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তোম ডবনের সম্মুখে ১২ ঘণ্টা অনশন পালন করেন। ১২ই ও ১৩ই জুলাই-এর জাতীয় সংহতি কনভেনশনও পূর্বসূচীকর্মসূচীরই অঙ্গ।

ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের গঠনশৈলীকে খণ্ড বিখণ্ড করার এই সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর, জটিল ও বিপদজনক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উক্ত সম্মেলন যে পথ গ্রহণ করছে তা হলো :

(১) সামগ্রিকভাবে পঃ বঙ্গ এবং বিশেষ করে কলকাতার জনমানসে, বিশেষতঃ যাঁরা কোন বিষয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে জনগণের সংগ্রামী ঐক্য অন্যতম পূর্বসর্ত বলে ভাবে, তাদের মাঝে আগামী দিনগুলিতে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে যে গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে সে সম্বন্ধে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সচেতনতা আনয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালাতে সচেষ্ট।

(২) জাতীয় অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারাকে ধ্বংস করে, ভারতবর্ষের স্বাধীন গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে পশুদস্ত করার আন্তর্জাতিক কায়দেমী স্বার্থবাজদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আজ সমগ্র জাতীয় রাজনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যে সুস্থ ধারণার উন্মেষ ঘটেছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। সম্ভবতঃ আমাদের শত্রুবর্গ জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ঐতিহ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করেনি,

কিন্তু স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্দার ভগৎ সিং, মাষ্টারদা সূর্যসেন, আসফাকুল্লা, কনকলতা, এবং মাতঙ্গিনীর মত শতসহস্র শহীদদের আত্মদান এবং নেতাজী সুভাষ, গান্ধীজী ও নেহেরুর সহজে লাভিত পথের সঙ্গে সমধর্মিতা লাভ করেছে।

(৩) আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে যে, ঐ সমস্ত দল ও ব্যক্তিবর্গ এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিগণিত হয়েও সম্প্রতি তারা একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাধারণ জাতীয় বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে কোনরকম রাজনৈতিক সুযোগ তোলার চেষ্টা না করে। সংগ্রামী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে এই সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গঠনমূলক সমালোচনা ও মতামত আদান প্রদান থেকে বিরত থাকা অবশ্যই উচিত হবে না। ১৯৬৮ সালের ২২শে জুন শ্রীনগর ঘোষণায় জাতীয় ঐক্যমতের এটিই ছিল প্রধান সুর। ১৯৮০ সালের বর্তমান মাসে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ পূর্বের তুলনায় আরও বেশী প্রাজ্ঞ হয়েছেন। আজকের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, ঝাড়খাম বাস্তবের ঘটনা ও সাম্প্রতিককালে উত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবির্ভাব ভবিষ্যতে আর কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলেই কারো মনে হবে না। পেন্টাগন ও তার দোসরদের বিশ্বব্যাপী সমর কৌশল লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারা ভারতবর্ষের বিপর্যয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিশীল হমকির মোকাবেলা করতে হলে এই রাজনৈতিক বোঝাপড়াকে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক চেতনার দর্পণে বিন্যাস করে, ব্যক্তি অনন্যতার ধারণাকে ভারতীয় আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি তথা বিশ্বমানবতার ধারণার সাথে একীভূত করে ফেলতে হবে। স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক-অধিকার লক্ষ্য সংগ্রামের আবেগময় আবেদন জনমানসকে এ বিষয়ে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু প্রতিজ্ঞাশীল বোকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আমরা জাতীয় জীবনের এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এই মহৎ প্রচেষ্টা সমাজ, অঞ্চল, জাতি ও শ্রেণীর গণ্ডীকে ভেদ করে আমাদের জনগণের মহত্তর গণতান্ত্রিক ঐক্য এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক উন্মেষ ঘটাতে ইতিবাচক দিক নির্দেশে সাহায্য করবে। এই বাবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হলে বিচ্ছিন্নতাবাদ যে বিরাট প্রচণ্ডতা নিয়ে ফেটে পড়বে এ আশঙ্কা আর কাল্পনিক নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে একের পর এক এই অশুভ লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলছে, যা সামগ্রিক জাতীয় ঐক্যকে এফোড়ু ওফোড়ু করে দেবার ঈঙ্গিত বহন করে।

(১) গত দু' বৎসরে এই দেশে সামরিক বাহিনীর সমতুল্য এক সেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রকাশে মুসলমানদের বিদেশী বলে ঘোষণা করেছে এবং তাদের বিশ্বাসঘাতক বলেও অভিহিত করেছে—আহ্বান জানিয়েছে তাদের ভারতীয় হবার জন্য। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্যান্যদের ওয়াকিবহাল করাই তাদের উদ্দেশ্য—এই সংস্থা সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। তাদের দাবী হোল তাদের তথাকথিত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘে ২ কোটির অধিক সভ্য আছে। এই সংস্থা ভয়ঙ্কর একরোখা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে আবাল বয়স্ক ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালভাবেই প্রবিষ্ট হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হবে ততোধিক সচেতনতা, অনলস প্রচেষ্টা এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠা। যদিও আলিগড় ও জামশেদপুরে বিভূৎস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের পর জাতির জীবনে এই বিশেষ আদর্শ-বাদের প্রতি হঠাৎই এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে এবং সাম্প্রতিক দলীয় রাজনীতির পরিবর্তন অনেকেই হয়ত ভাববেন যে ঐ বিশেষ

সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে—তক্ষনি একথা ভাবার কোন যুক্তি নেই যে ঐ শক্তি বা গোষ্ঠি ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের জন্মবিকাশ এবং দেশের মিশ্র সংস্কৃতির যথার্থ প্রসারের পথে কোন গুরুতর বাধার সৃষ্টি করবে না।

(২) ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনবাদের জিগির তুলে মুসলিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জন্মপ্রসার এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও অন্যান্য মার্গপন্থীদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

বিহার ও অন্যান্য রাজ্যে জাতিভেদপ্রথা জঘন্যভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং হরিজন নিধন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে এসেছে। পার্বত্য এলাকা ও সমতল ভূমিতে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা হয়েছে দুর্বিষহ। ১৯৭৭ সালে বেলচী ও ধর্মপুরের ঘটনা এবং হালফিল নারায়ণপুর, পরশবিঘা, দাহিয়া প্রভৃতি স্থানের ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে যে আইনের প্রত্যাহুতি যথেষ্ট নয়। এক সুনির্দিষ্ট ও সুব্যবস্থিত পথে আজ জাতীর মহা অভিযান পরিচালনা করা একান্ত দরকার। হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবশ্যই বদলাতে হবে।

তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে নাগা, মিজো, খাসিয়া, নেপালী, মণিপুরী, সিকিমী, ত্রিপুরী এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উপজাতীদের অবস্থা হঠাৎ স্বলে ওঠার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সবথেকে বিশৃঙ্খল অবস্থা আজ আসাম ও ত্রিপুরায়—যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং তা ক্রমশঃ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রেও বিগত কয়েক বছরের নিষ্ক্রিয়তা এই অবস্থার জন্য দায়ী এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সীরা দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ংস্বত্বতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র-

ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রকল্পিত ও বিখণ্ডিত করে সামাজিক ব্যবস্থাকে তখনই করা যায় আসামের ঘটনা তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ হোল উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত । তারা বহু শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জেগেছে । কিছু কিছু বিদেশী মিশনারী সম্প্রদায় তাদের সুসভ্য করতে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়েছে । কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এই শ্রেণীর মানুষ নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে । একথা সত্য যে এইসব সংবেদনশীল এলাকার চাপা উত্তেজনা সম্বন্ধে সরকার সচেতন । কিন্তু আমরা যে কেন তাদেরকে আমাদের জীবনপ্রোত্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারিনি এই প্রশ্ন আজ প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমী ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে ।

উপরোক্ত গটভূমিতে প্রত্যেক ভারতবাসী এই আশা করে যে, দেশের সরকার এবং সকল রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত সমন্বয় ও এক নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও জনগণের মূল গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সম্বন্ধে রক্ষা করার জন্য এক আন্দোলন গড়ে তুলতে একত্রে কাজ করবে ।

জাতীয় সংহতি রক্ষা আন্দোলনের পরিকল্পিত মূল্যবোধ ও ধারণাকে আজ আবার নতুন করে ঘোষণার প্রয়োজন পূর্বাশঙ্কা বর্তমানে আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে ।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা এবং এক ধরনের নিয়মানুবর্তিতার ফলে অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে জাতীয় সংহতি প্রায় অজি'ত হয়েছে এবং অসংহতির কারণগুলি দ্রুত নিমূল হচ্ছে । এমন কি সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে খুব সাধারণ হ'শিয়ারীকেও অনেক মুখ্যমন্ত্রী এবং দিল্লীর অনেক প্রথম শ্রেণীর আমলা অপ্রয়োজনীয় ও প্ররোচনামূলক বলে অভিহিত করেছেন । কিন্তু সমস্যার গভীরতার কথা ভাবলে বোঝা যাবে যে এই

তথাকথিত সামাজিক শান্তি ও আত্মসংযমবোধ বাস্তবিকপক্ষে কত নড়বড়ে। কারণ তা দেশের নতুন সংস্কৃতির প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে গড়ে ওঠে নি।

এখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্দেশ্যাত্মক দিক-গুলিও কম মূল্যবান নয়। সমসাময়িক আন্দোলন পুনরায় এক নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। এবং তা দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের মনে আশার সূচনা করেছে। নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তারা তাদের নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতি শীঘ্রই নিজস্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু তারাও অতিশীঘ্র অপসংস্কৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও শহর-জীবনের চাকচিক্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এই তো হল সাম্প্রদায়িক দল, মিশনারী সংস্থা ও অন্যান্য ভোগোৎপাদনকারী সংস্থার অত্যাৎসাহ এবং কর্মপ্রেরণার পরিণতি।

বর্তমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হাজার হাজার গ্রামীণ ছেলেমেয়ে বর্তমান শিক্ষালাভ করে সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক এবং বিপ্লবজীন সংস্কৃতির সামনে উপস্থিত হচ্ছে। কাজে কাজেই গ্রামঞ্চলের বুদ্ধি-জীবীদের এই নতুন প্রজন্ম, যাদের কোন সাংস্কৃতিক প্রীতিহা নেই, তারাই সামন্ততান্ত্রিক, সংস্কারবিরোধী সংস্কৃতি অথবা ঔপনিবেশিক বিপ্লবজীন বর্ণশঙ্কর সমাজব্যবস্থার সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র, শিক্ষক ও যুবসমাজ যে স্ব-আরোপিত মূল্যবোধের মাঝে বড় হয়ে উঠেছে তা অসহিষ্ণুতা, হিংসা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, ধান্দাবাজি এবং সুবিধাবাদকেই প্রেরণা দেয়। এই ভাবেই অশ্লীল ও সমাজবিরোধী সাহিত্য যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমাদের মাটিতে অসংহতির শক্তিকে উর্বরতা দান করা হচ্ছে—যা ব্যাপকভাবে আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে জাতীয় ও সমাজ জীবনে ক্ষয়সংকেত আনবে।

জাতীয় সংহতির এই আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন আজ খুব বেশী অনুভূত হচ্ছে। কারণ সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, উপজাতি এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এক নতুন কৃত্রিম শোভনসুন্দর আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আর তাই সমাজ-বিরোধী, জাতীয়তা-বিরোধী ধ্যানধারণা ব্যাপকভাবে সুনিশ্চিত পথে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ ও শান্তির নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে।

সুতরাং অন্ততঃপক্ষে জাতীয় স্তরে জাতীয় সংহতি কাউন্সিলের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি রক্ষা আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার কথা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। ১৯৬৮ ও পরবর্তী কালে এই কাউন্সিলের কার্যাবলীর কথা স্মরণ রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত হতে পারে :

(১) কার্য পরিচালনার জন্য এই বিভাগগুলি অর্থাৎ—(ক) শিক্ষা, (খ) মহিলা, (গ) সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিষয়ক, (ঘ) শ্রম ও (ঙ) সংবাদপত্র উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। নতুন পথ ও উপরোক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে এই কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(২) উপরোক্ত বিভাগগুলির পুনর্গঠন ও ব্যাপকতাদানের ফলে নতুন অবস্থা উদ্ভূত হলে কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করে তাদের হাতে গৃহীত কার্যসূচীর পর্যালোচনার ভার অর্পণ করা হবে। এই ভাবে যখন নিয়ন্ত্রণে এ বিষয়ে জাওয়া অর্জিত হবে তখন অনেক কু-সমালোচক রাজনৈতিক দল ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। শুধু দলের সর্বোচ্চস্তরেই এই পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করার অর্থ হল অযথা বিলম্বকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং একদল উৎসর্গী কর্মী যারা এই কাজকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করা।

(৩) এই কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রেরণ অনেকটা বৃত্তিমূলক হবে, যেমন :—(ক) কৃষক, (খ) ছাত্র, (গ) শিক্ষক, (ঘ) শিক্ষাবিদ (ঙ) যুবক, (চ) মহিলা (ছ) সাংবাদিক (জ) লেখক ও শিল্পী (ঝ) সমাজসেবী, (ঞ) মন্ত্রী, (ট) ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, (ঠ) সংসদ সদস্য, (ড) সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী।

(৪) কিন্তু এই স্থায়ী সমিতি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী এবং কৃতসঙ্কল্প মানুষ, যাদের পিছনে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলের সমর্থন আছে, তাদের নিয়ে গঠিত হলেই তবে তা পূর্বের সমিতি অপেক্ষা অধিক কর্মক্ষম সমিতিতে পরিণত হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে উদাসীনতার অর্থ হোল আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে এক বাস্তব বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিমজ্জিত করে এক অবিদ্যমান সম্ভাব্য পরিণত করা এবং অনাগত বৎসরের নিরাপত্তাকে অবলুপ্ত করা।

কিভাবে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

(১) জাতীয় সংহতি রক্ষা অভিযান শুরু হবে :

(ক) জাতীয় প্রতিরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ যুক্তিবাদ এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারা ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক নতুন জাতীয় সংস্কৃতির জন্য এই অভিযান যে অপরিহার্য তা ব্যাখ্যা করা, এবং

(খ) কেবা শত্রু কেবা मित्र তা দেখিয়ে দেওয়া।

(২) সকল দেশপ্রেমিক মানুষ ও রাজনৈতিক দল নিয়ে বড় সমিতি গঠন করতে হবে। এদের দায়িত্ব হবে জনগণকে বোঝানো যে, যেহেতু এটি একটি জাতীয় বিষয় সেহেতু এর মোকাবিলায় জনা দরকার সব দল ও মানুষের মিলিত সংগ্রাম।

(৩) এই সমিতির যোগ্য কর্মী হবেন— (ক) গবেষক, (খ) লেখক (গ) শিল্পী (ঘ) খেলোয়াড় (ঙ) সমাজ সেবী (চ) যুবক-যুবতী সম্প্রদায়। এর সঙ্গে যুক্ত হবে সরকারী প্রচেষ্টা ও গণ উদ্যোগ।